আমি পদ্মজা শেষ পর্ব (দ্বিতীয় ও শেষ অংশ)

২০০৯ সাল। দেখতে দেখতে কেটে গেল তেরোটি বছর। পদ্মজা দরজা খুলে বারান্দায় দাঁড়ালো। সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ি কুয়াশা হাড় কাঁপানো শীত নিয়ে জড়িয়ে ধরে তাকে। পদ্মজা দুই হাতে চাদর টেনে ধরলো। যত দূর চোখ যায় কেবল সবুজের হাতছানি। চা বাগানের সারি সারি টিলা, আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ আর ঘন সবুজ অরণ্য! আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি কত সুন্দর! রঙহীন ধূসর কুয়াশাও চা বাগানের সৌন্দর্য আড়াল করতে পারলো না। কুয়াশার জন্য যেন অন্যরকম সুন্দর লাগছে। এই অপরূপ সৌন্দর্য যে কাউকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম । তবে বৃষ্টিস্নাত পাহাড়ি সৌন্দর্য সবচেয়ে বেশি সুন্দর। পদ্মজা দুই পা তুলে বেতের চেয়ারে বসলো। তার মুখ শুষ্ক। আজ তার প্রাণের চেয়েও প্রিয় প্রিয়তমর

মৃত্যুবার্ষিকী! প্রিয়তম মারা গিয়েও যেন সর্বত্র বিছিয়ে রেখে গেছে ভালোবাসার ডালপালা। পদ্মজা সময়-অসময়ে,কারণে-অকারণে বার বার সেসব ডালপালার বেড়াজালে আটকে পড়ে। নিজেকে বড় নিঃস্ব মনে হয়।

পদ্মজা তার হাতের লাল খামটি থেকে দুটো চিঠি বের করলো। সে প্রতিদিন এই চিঠি দুটো পড়ে দিন শুরু করে। যতক্ষণ পড়ে,মনে হয় যেন আমিরের সাথে কথা বলছে! তার একদম পাশ ঘেঁষে ফিসফিসিয়ে আমির বলছে,' ,পদ্মবতী,ভালোবাসি।'
পদ্মজা চিঠি দুটিতে প্রথমে চুমু দিল। তারপর একটি চিঠির ভাঁজ খুললো। শুরুতে কোনো সম্বোধন নেই। অদ্ভুত একখানা চিঠি। চিঠিও বলা যায় না,এক পৃষ্ঠায় লেখা এক রাজা ও রানির গল্প। পদ্মজা পড়া শুরু করলো-

“এক ছিল দুষ্টু রাজা! নারী আর টাকার প্রতি ছিল তার চরম আসক্তি। যে নারী একবার তার বিছানায় যেত তার পরের দিন সে লাশ হয়ে নদীতে ভেসে যেত। রাজা এক নারীকে দ্বিতীয়বার ছুঁতে পছন্দ করতো না। কিন্তু সমাজে ছিল রাজার বেশ নামডাক! সবার চোখের মণি। খুন করা ছিল তার নিত্যদিনের সঙ্গী। তার কালো হাতের ছোঁয়ায় বিসর্জন হয়েছে শত শত নারী। প্রতিটি বিসর্জন রাজার জন্য ছিল তৃপ্তিকর। নারী ব্যবসায় লাভবান হয়ে গড়ে তুলে প্রাসাদের পর প্রাসাদ! একদিন চাচাতো ভাইয়ের সাথে বাজি ধরে হেরে গেল রাজা। শর্তমতে,ভাইয়ের জন্য এক রাজকন্যাকে অপহরণ করতে যায়। সেদিন ছিল বৃষ্টি। সন্ধ্যার আগ মুহূর্ত। রাজকন্যার প্রাসাদে সেদিন কেউ ছিল না। রাজা এক কামরায় ওৎ পেতে থাকে। রাজকন্যা আসলেই তাকে তার কালো হাতে অপবিত্র করে দিবে।

কামরায় ছিল ইষৎ আলো। অনেকক্ষণ অপেক্ষার পর সেই কাঙ্খিত মুহূর্ত আসে। রাজকন্যার পা পড়ে কামরায়। রাজকন্যা রাজাকে দেখে চমকে যায়। ভয় পেয়ে যায়। কাঁপা স্বরে প্রশ্ন করে "'কে আপনি? খালি বাড়িতে কেন ঢুকেছেন?" সেই কণ্ঠ যেন কোনো কণ্ঠ ছিল না। ধনুকের ছোঁড়া তীর ছিল। রাজার বুক ছিঁড়ে সেই তীর ঢুকে পড়ে। রিনঝিনে গলার রাজকন্যাকে দেখতে রাজা আগুন জ্বালায়। আগুনের হলুদ আলোয় রাজকন্যার অপরূপ মায়াবী সুন্দর মুখশ্রী দেখে রাজা মুগ্ধ হয়ে যায়। তার পা দুটো থমকে যায়। রাজকন্যা যেন এক গোলাপের বাগান। যার সুগন্ধি ছড়িয়ে পড়ে রাজার কালো অন্তরে। রাজা নেশাগ্রস্তের মতো উচ্চারণ করলো নিজের নাম। নাম শুনেও রাজকন্যার ভয় কমলো না। পালিয়ে গেল অন্য কামরায়। রাজা কিছুতেই ভুলতে পারছিল না রাজকন্যার

মুখ। তার চেনা পৃথিবী চুরমার হয়ে যায়। রাজকন্যার কামরার সামনে দাঁড়িয়ে থাকে মুহূর্তের পর মুহূর্ত। সেদিনই ঘটে গেল দূর্ঘটনা। রাজ্যবাসী শূন্য প্রাসাদে দুষ্টু রাজা ও মিষ্টি রাজকন্যাকে এক সঙ্গে দেখে ফেললো। রাজকন্যার গায়ে লেগে গেল কলঙ্ক। কয়েকজন অমানুষ রাজকন্যাকে নোংরা ভাষায় হেনস্তা করলো। সেই দৃশ্য দেখে রাজার বুকে রক্তক্ষরণ শুরু হয়। সে নিজ প্রাসাদে ফিরে এক দণ্ডও শান্তি পেল না। তার চাচাতো ভাইকে তাৎক্ষণিক আদেশ করলো যারা রাজকন্যাকে তাদের মুখ দিয়ে অপমান করেছে তাদের যেন জিহবা ছিঁড়ে ফেলা হয়,যে হাত দিয়ে রাজকন্যাকে ছুঁয়েছে সে হাত যেন কেটে দেয়া হয়, যে চোখ দিয়ে রাজকন্যাকে লোলুপ দৃষ্টিতে দেখেছে সে চোখ যেন উপড়ে ফেলা হয়। ভোররাতে দুষ্টু রাজা খবর পেল, রাজকন্যার মাতা সেই অমানুষ

দের হত্যা করেছে। এতে রাজা খুশি হলেও রাজকন্যার মাতাকে নিয়ে একটা চাপা ভয় কাজ করে। কিন্তু বেশিক্ষণ রাজকন্যার মাতাকে নিয়ে ভাবলো না। রাজকন্যাকে যে ভোলা যাচ্ছে না। তাকে যে করেই হউক পেতে হবে৷ নয়তো জীবন বৃথা। রাজা তার পিতাকে আদেশ করলো, মায়াবতী রাজকন্যাকে তার চাই ই চাই। নয়তো সে বাঁচবে না। এই পৃথিবী তোলপাড় করে দিবে৷ রাজার পাগলামি দেখে অবাক তার পরিবার। সালিশ বসে। সালিশে সেই দুষ্টু রাজা রাজকন্যার মাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি থেকে রেহাই পেয়ে,জিতে নিল রাজকন্যাকে। তিনি এক কথায় রাজকন্যাকে দিতে রাজি হলেন। আনন্দে রাজার বুকে উথাল ঢেউ শুরু হয়। কী অসহ্য সুখময় যন্ত্রণা! রাজা এর আগে এতো খুশি হয়েছে নাকি জানা নেই! যথাসময়ে তাদের বিয়ে হলো। রাজকন্যা রাজার রানী হলো। নাম তার পদ্মবতী। ফুলের মতো পবিত্র

সে,সদ্যজাত শিশুর মতোই নিষ্পাপ। রাজা ভুলে গেল নারী সঙ্গের কথা,ভুলে গেল তার রাজত্বের কথা। তার ধ্যানজ্ঞান সীমাবদ্ধ হয়ে গেল পদ্মবতীতে। পদ্মবতীর একেকটা কদম রাজার বুকে ঢেউ তুলে,পদ্মবতীর প্রতিটি নিঃশ্বাস থেকে যেন ফুল ঝরে পড়ে। পদ্মবতীর পায়ে চুমু দেয়ার সময় রাজার চিৎকার করে বলতে ইচ্ছে হয়,'পদ্মবতী...আমার রানী,আমি কাঁটা বিছানো বাগানে শুয়ে থাকি তুমি আমার বুকে হেঁটে বেড়াও।'

ধীরে ধীরে রাজা উপলব্ধি করতে পারলো, তার পদ্মবতী পবিত্র। এতোই পবিত্র যে সে কখনো অন্যায়ের সাথে আপোষ করবে না।
এই পবিত্রতা রাজাকে আরো আকৃষ্ট করে ফেললো। সেই সাথে রাজা ভয় পেল,তার কালো অন্তরের খবর যদি পদ্মবতী জেনে যায় তখন কী হবে? কেলেঙ্কারি হয়ে যাবে। ধরে

বেঁধে রাখা গেলেও পদ্মবতীর ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হয়ে যাবে। এই বিচ্ছেদ সহ্য করার ক্ষমতা তার হবে না। নির্ঘাত মরে যাবে। যে ভালোবাসা নিজ ইচ্ছায় তাকে বিমুগ্ধ করে তুলে,সে ভালোবাসা জোর করে সে কখনো নিতে পারবে না। রাজা তার পাপ লুকিয়ে রাখতে মিথ্যা কথা বলা ও মিথ্যা অভিনয় করা শুরু করলো। পদ্মবতীর থেকে সহানুভূতি আর বিশ্বাস অর্জন করতে গল্প বানালো৷ তার পাপের মহলে নিরাপত্তা বাড়িয়ে দিল। প্রয়োজনে সে পৃথিবীর প্রতিটি মানব সন্তানকে খুন করতে প্রস্তুত,তাও তার পাপের জন্য পদ্মবতীকে হারাতে চায় না।
যথাসম্ভব পদ্মবতীকে নিয়ে দুষ্টু রাজা অন্য রাজপ্রাসাদে চলে আসে। সেই প্রাসাদে রাজা আর তার পদ্মবতী ছাড়া কেউ নেই! ভালোবাসার সোহাগ ও খুনসুটিতে ভরে উঠে তাদের ঘর। রাজার দৃষ্টি ডুবে যায়

একজনেতে! কোনো নারী আর তাকে টানতে পারলো না। প্রতিটি প্রহর পদ্মবতীকেই নতুন করে অনুভব করে। নারী আসক্তি চিরতরে তাকে ছেড়ে গেল। কিন্তু নারী ব্যবসা রয়েই গেল। সৎ পেশার অজুহাতে অসৎ পেশা জ্বলজ্বল করে তখনো জ্বলছিল। মাঝেমধ্যে রাজার ভয় হতো,পদ্মবতী সব জেনে যাবে না তো? রাজা সব রকম পট্টি বেঁধে দিল পদ্মবতীর চোখে। পদ্মবতী সেই পট্টিসমূহ ভেদ করে পৌঁছাতে পারলো না গভীরে! ভালোবাসার বেড়াজালেই আটকে রইলো।

বছর দেড়েক পর তাদের ঘর আলো করে এলো এক রাজকন্যা। রাজকন্যা ছিল মায়ের মতোই সুন্দর। আকাশে একটা চাঁদ উঠে,কিন্তু রাজার আকাশে উঠেছিল দুটো চাঁদ! ছোট্ট রাজকন্যাকে দেখে রাজার বুক কেঁপে উঠে। তৃতীয়বারের মতো কোনো মেয়ের প্রতি সে

ভালোবাসা অনুভব করে। তার প্রথম ভালোবাসা তার মা,দ্বিতীয় ভালোবাসা স্ত্রী, আর তৃতীয় ভালোবাসা তার কন্যা! রাজা যতবার রাজকন্যাকে কোলে নিত, বুকে একটা ব্যথা অনুভব করতো। বার বার মনে হতো, আমার জগৎ-সংসার একটু সাধারণ হতে পারতো না? এই চিন্তা তার অসৎ কাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। সে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। তার দলবল চিন্তিত হয়ে পড়ে। কাজের প্রতি রাজার উদাসীনতা তাদের ক্ষিপ্ত করে। পূর্ব ক্ষোভের জেদ ধরে তারা রাজার দূর্বলতা লক্ষ্য করে তীর ছুঁড়ে মারে। সেই তীরে ছোট্ট রাজকন্যার প্রাণের আলো নিভে যায়। রাজার বুক থেকে একটা চাঁদ খসে পড়ে! পদ্মবতী ভেঙে গুড়িয়ে যায়। পদ্মবতীর ব্যথা সহ্য করার ক্ষমতা রাজার নেই। শক্ত দুই হাতে আঁকড়ে ধরে পদ্মবতীকে। তার কন্যার খুনিকে সে নিজ হাতে কোপাতে পারলেও,খুনের আদেশ দাতাদের হত্যা করতে

পারলো না। জানতে পারলো তার পিতা,চাচা ও চাচাতো ভাইয়ের আদেশে তার রাজকন্যার চোখ দুটি চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে! ততদিনে রাজা এটাও বুঝে গেল, যে জগতে সে প্রবেশ করেছে সেই জগতের শেষ পরিণতি মৃত্যু। সে যদি খুনের আদেশ দাতাদের ক্ষতি করে তার ব্যবসা ডুবে যাবে৷ ব্যবসার খুঁটি সে হলেও, আদেশ দাতারা সেই খুঁটি ধরে রেখেছে। আর ব্যবসার পতন মানে পদ্মবতীর সব জেনে যাওয়া। সেই সাথে অন্য রাজাদের ক্ষোভের শিকার হওয়া। যে রাজাদের সাথে মিলে দুষ্টু রাজা পাপ জমায় তারা হিংস্র হয়ে উঠবে। আর তারা দুষ্টু রাজার উপর ক্ষিপ্ত হলে ক্ষতি হবে পদ্মবতীরও। এতোজনকে রুখতে যাওয়ার ক্ষমতা দুষ্টু রাজার নেই। আবার মাথার উপর আছে শাসকের আদালত! একমাত্র রাজার মৃত্যু পারে তার কন্যার খুনীদের ধ্বংস করতে। কিন্তু রাজা নিজেকে উৎসর্গ করতে চায় না।

পদ্মবতীর সাথে সারাজীবন বাঁচতে চায়। তাই রাজা ধামাচাপা দিল রাজকন্যার ব্যথা! বাবা হিসেবে হেরে গেল, চুপসে গেল। অভিশাপ সেই রাজাকে। অভিশাপ!
"

পদ্মজা চিঠির উপর হাত বুলিয়ে দিল। যখন সে প্রথম এই বাস্তব রূপকথা পড়েছিল, সাদা অংশে শুকনো রক্ত লেগে ছিল। তার প্রিয় স্বামীর রক্ত! আমিরের শরীরে পাওয়া গেছে অগণিত কামড়ের দাগ, চাবুক মারার দাগ, ছুরির আঘাতের দাগ। সে নিজেকে শেষ দিনগুলোতে অনেক আঘাত করেছে। নিজেকে রক্তাক্ত করে পাতালঘরে আর্তনাদ করেছে। পদ্মজা হাতের উল্টো পাশ দিয়ে চোখের জল মুছে দ্বিতীয় চিঠিটি হাতে নিল। ভাঁজ খুললো,

"

প্রিয়র চেয়েও প্রিয় পদ্মবতী,
আমার পাপের রাজত্বে তোমার আগমন ভূমিকম্পের মতো ছিল। যখনই দেখি তুমি দাঁড়িয়ে আছো,আমার হৃৎপিণ্ড থমকে যায়। চোখের সামনে ছয় বছরে গড়ে তোলা ভারী দেয়াল ভেঙে চুরমার হয়ে যায়।

আমার চোখের মণি পদ্মজা,তোমার ওই দুচোখের অবিশ্বাস্য চাহনি আমাকে ছিন্নভিন্ন করে ফেলে। আমার কথা হারিয়ে যায়। আমি স্তব্ধ হয়ে যাই। খারাপের মাঝেও ভালো থাকার মন্ত্র ছিল তোমার দৃষ্টি। সেই দৃষ্টিতে যখন ঘৃণা দেখতে পাই,আমার বুক পুড়ে যায়। আমার মস্তিষ্ক ফেটে যায়!

তোমার আহত মুখশ্রী দেখে আমার শরীরের চামড়া ঝলসে যায়। তোমার চোখের জল দেখে সমুদ্র আছড়ে পড়ে মাথার উপর।

আমার মিথ্যাচার, আমার প্রতারণা তোমাকে কষ্টের ভুবনে ছুঁড়ে ফেলে। বিষাদের ছায়া ঢেকে যায় তোমার চোখ। সেই বিষাদটুকু মুছে দেয়ার অধিকার আমি হারিয়ে ফেলি। যদি পারতাম আকাশের মেঘ হয়ে তোমার কাজলকালো আঁখি ছুঁয়ে সবটুকু বিষাদ ধুয়েমুছে সাফ করে দিতাম।

আমার প্রথম ও শেষ ভালোবাসা, তুমি একটু দূরে সরলেই যে আমি মনে মনে পুরো পৃথিবী ভস্ম করে দেয়ার ইচ্ছে পুষি, সেই আমি পরিষ্কার দেখতে পেলাম,তোমার-আমার পথচলা এখানেই শেষ! আমি শান্ত পাথরের মতো স্থির হয়ে যাই। গন্তব্য হারিয়ে ফেলি। এই ভুবনে তুমি আমার শেষ আশ্রয়স্থল ছিলে। আম্মার সাথে তখন যোজন যোজন দূরত্ব। তোমার ঘৃণাভরা চাহনি আমাকে চোখের পলকে পুড়িয়ে দেয়। তোমার আমার বিচ্ছেদ

আমাকে আঙুল তুলে দেখিয়ে দেয়, প্রেমানলে জ্বলতে জ্বলতে আমি অনেক আগেই নিঃশেষ হয়ে গেছি।

সোনালি রোদ্দুরের মতো সুন্দর পদ্মবতী, আমি তোমাকে আঘাত করে নিজে মরে গিয়েছি। যে হাতে আঘাত করেছি সেই হাত পুড়ে যাক,পোকামাকড় খাক! তোমাকে ব্যথা দিয়ে আমি ভালো নেই। ছুরির আঘাতও আমার মনের ব্যথার চেয়ে বেশি হতে পারছে না। যদি পারতাম হয় তোমাকে ভালোবাসতাম ,নয় শুধু হাওলাদার বংশে জন্ম নিতাম। দুটো একসাথে গ্রহণ করতাম না। দুই সত্ত্বা মস্তিষ্কের দ্বন্দ্বে আমাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে।

আমি নিষ্ঠুর,তুমি মায়াবতী
আমি ধ্বংস,তুমি সৃষ্টি
আমি পাপ,তুমি পবিত্র

এতো অমিলে কেন হলো মিলন? কেন কালো অন্তরে ছড়িয়েছিল ফুলের সুবাস? আমাকে ধ্বংস করার কি অন্য কোনো অস্ত্র ছিল না? এমন কঠিন কষ্ট কেন দেয়া হচ্ছে আমাকে? তোমার ব্যথায় আমি দগ্ধ হচ্ছি। তোমার কান্না,তোমার আর্তনাদ আমার মস্তিষ্কের প্রতিটি নিউরনকে কাঁপিয়ে তুলে। মনে হয়,মাথার ভেতর পোকারা কিলবিল করছে৷ বিচ্ছেদের বিষাক্ত ছোবলে নীল হয়ে যাচ্ছি আমি। আমাকে বাঁচাও!

শূন্য আকাশে গাঙচিল যেমন একা আমিও তেমন একা। প্রতিটি মুহূর্ত আমাকে অনুশোচনায় দগ্ধ করে। একাকী নীরবে সহ্য করি। এটাই তো আমার প্রাপ্য। মেয়েগুলোকে বাঁচাতে চেয়েও বাঁচাতে পারিনি। বুকের উপর পাথর চেপে পাঠিয়ে দিয়েছি বহুদূরে। যখন তাদের জাহাজে তুলে দিয়েছি আমার দিকে

করুন চোখে তাকিয়ে ছিল। ব্যথিত হৃদয় প্রথমবারের মতো অনুভব করে, তারাও তো আমার মতো কষ্ট পাচ্ছে! কিন্তু তখন আমার আর সামর্থ্য ছিল না।

আমার জীবনের বসন্তকাল তুমি। তোমার অসহ্য আলিঙ্গন আমার সহ্যের বাইরে ছিল। তোমার আর্তনাদ করে পালিয়ে যাওয়ার অনুরোধ করা আমার নিঃশ্বাস বন্ধ করে দেয়। সত্যি যদি পারতাম,পালিয়ে যেতে! কিন্তু তা আর সম্ভব নয়। আমার আকাশ সমান পাপ আমার পিছু ছাড়বে না। আজীবন দৌড়াতে হবে। এক দন্ডও শান্তি মিলবে না।

মেঘলা বরণ অঙ্গের সাম্রাজ্ঞী, তোমার ভালোবাসার সাম্রাজ্যে কাটিয়ে দিতে চেয়েছিলাম শত জনম। হলো না। তোমার চোখের খাদে পড়ে থাকতে চেয়েছিলাম আজীবন। তাও হলো না। সময় এসেছে

আমার বিদায়ের! আমাদের পথচলা এতটুকুই। আমি ছিলাম দূর্গের মতো কঠিন। সেই দূর্গ তুমি ভেঙে গুড়িয়ে দিয়েছো। ভালোবাসা আমার হাঁটু ভেঙে দিয়েছে। আমার আর উঠে দাঁড়ানোর সুযোগ নেই। শেষ বারের মতো তোমাকে ছুঁয়ে যেতে চাই। আমার প্রেম তুমি,আমার ভালোবাসা তুমি। সত্যি বলছি,আমার জীবনে আসা প্রতিটি নারী আমাকে নয় আমার হারাম টাকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে। তাদের আমি কিনে নিয়েছি। শারমিন আর মেহুল দুজনকে বাড়ি উপহার দিয়ে তারপর আমাকে বিয়ে করতে হয়েছে। তাও আমি অপরাধী। আমি তাদের ঠকিয়েছি, প্রতারণা করেছি,খুন করেছি। আমি অনুতপ্ত। বড্ড আফসোস হচ্ছে,বড্ড আক্ষেপ থেকে গেল। ওপারেও আমি তোমাকে পাবো না! আমার মতো ঘৃণিত ব্যাক্তি তোমার পাশে দাঁড়াতে পারবে না। আমার জায়গা

হবে,জাহান্নামের কোনো এক দুর্গন্ধময় জগতে! তোমাকে দেখার তৃষ্ণা , তোমাকে ছোঁয়ার আকাঙ্ক্ষা আমার মিটলো না। হয়তো সহস্র বছরেও মিটবে না।

আমার হৃদয়ের রঙহীন বাগানের রঙিন প্রজাপতি, সাদা শাড়িকে তোমার সঙ্গী করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্য দুঃখিত। তুমি মুক্ত হবে। পাখির মতো উড়বে। শুধু আমি থাকবো না পাশে। আফসোস!

চিঠির শেষ প্রহরে এসে হাত কাঁপছে। চিৎকার করে কাঁদতে ইচ্ছে হচ্ছে। এই পৃথিবীতে আমি আরেকটু থাকতে চাই। এই পৃথিবীর সবুজ বুকে তোমাকে নিয়ে প্রতিটি ভোর হাঁটতে চাই। আমাদের ভালোবাসার জ্যোৎস্না রাতগুলো আরেকটু দীর্ঘ হলে কী এমন হতো? আমাদের প্রেমের পরিণতি এতো নিষ্ঠুর কেন হলো? তোমার ওই ঘোলা চোখের মায়াজাল ছেড়ে

চলে যেতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। কিন্তু যেতে হবেই। আর থাকা যাবে না। সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। তোমার কোনো ক্ষতি হওয়ার আগে,আমাকে সব কীটদের নিয়ে এই পৃথিবী ছাড়তে হবে।

আমার আঁধার জীবনের জোনাকি,
সৃষ্টিকর্তাকে বলো আমাকে যেন আরেকটা সুযোগ দেয়া হয়। এই পৃথিবীতে আবার যেন পাঠানো হয়।
পৃথিবীর বুকে তো জায়গা, সম্পদের অভাব নেই। আরেকটা জীবন কি পেতে পারি না? তখন আমি কঠিন পরীক্ষা দেব। তোমাকে পেতে আগুনের উপর দিয়ে হাঁটবো, ভাঙা কাচের ধারে পা ছিন্নভিন্ন করে হলেও তোমাকে জিতে নেব। থাকবে না কোনো অন্ধকার জগতের হাতছানি,তৈরি হবে তোমার আমার

প্রেমের উপাখ্যান। আমাদের ভালোবাসা দেখে জ্যোৎস্না ও তারকারাজি ঝলমলিয়ে ওঠবে।

আমাদের আবার দেখা হবে। কোনো না কোনো ভাবে আবার দেখা হবে। দেখা হতেই হবে। নিজের খেয়াল রেখো। ঠিকমতো খাওয়া দাওয়া করো। পূর্ণা, মা হেমলতার কাছে নিশ্চয়ই ভালো আছে। চিন্তা করো না। পারলাম না আরো কয়টা দিন তোমাকে আগলে রাখতে। ক্ষমা করো আমায়। অতৃপ্ত আমি মৃত্যুকে তৃপ্তি হিসেবে গ্রহণ করছি।

ইতি,
আমির হাওলাদার "

চোখের সামনে ছবির মতো ভেসে উঠে, আমিরের শেষ চাহনি। রক্ত বমি করে মাটিতে লুটিয়ে পড়া! ভেসে উঠে সেই শিশি। যে শিশির উপরে বড় বড় করে লেখা ছিল Poison (বিষ)। পদ্মজা দুটো চিঠি বুকের সাথে

জড়িয়ে ধরলো। তারপর শূন্য আকাশে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়লো। এই চিঠি যেদিন প্রথম পড়লো সে,চিৎকার করে কেঁদেছে। সে আমিরকে খুন করে অনুতপ্ত নয়। সে কাঁদে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে!

দরজায় ঠকঠক শব্দ হচ্ছে৷ পদ্মজা দ্রুত চিঠি দুটো ভাঁজ করে খামের ভেতর রেখে দিল। গলার স্বর উঁচু করে বললো,'বলো বুবু।'

দরজার ওপাশ থেকে লতিফার কণ্ঠস্বর ভেসে আসে,'মাহবুব মাস্টার আইছে?'

পদ্মজা বললো,'নাস্তা তৈরি করো। আমি আসছি।'

পদ্মজা চোখের পানি মুছে ঘরে আসলো। আয়নায় দেখলো,সে যে কেঁদেছে বুঝা যাচ্ছে নাকি। না বুঝা যাচ্ছে না। গায়ের শালটি রেখে আলনা থেকে আরেকটি কালো শাল নিয়ে ভালো করে মাথা ঢেকে নিল। তারপর দরজা

খুলে বেরিয়ে আসে। বৈঠকখানার সামনে গিয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ালো।
মাহবুব মাস্টার বসে আছেন। তার বয়স পঞ্চাশের কাছাকাছি। তিনি অংকের মাস্টার। পদ্মজা আর তিনি এক স্কুলের শিক্ষক। ভালো পড়ান। তার সামনে বসে আছে তিনটি ছেলেমেয়ে। এই তিনজনকে পড়ানোর জন্যই পদ্মজা মাহবুব মাস্টারকে ডেকেছে। মাহবুব মাস্টার বারো বছরের ছেলেটিকে আগে প্রশ্ন করলেন,'তোমার নাম কী?'
ছেলেটি প্রবল উৎসাহ নিয়ে বললো,'আমার নাম নুহাশ হাওলাদার। আর ওর নাম...'
মাহবুব নুহাশকে থামিয়ে দিলেন। বললেন,'তুমি শুধু তোমার নাম বলো। অন্যজনেরটা বলতে বলিনি। কাঁটা থুতুনি তোমার নাম কী?'
'আমীরাতুন নিসা নুড়ি।' নুড়ি অবাক হওয়ার ভান করে নিজের নাম বললো। তার থুতনিতে

গর্ত আছে বলে কি তাকে কাঁটা থুতুনি ডাকতে হবে! সে মনে মনে ব্যথা পেয়েছে। নুড়ির পাশে বসে থাকা দশ বছরের মেয়েটি বললো,'আমার নাম জিজ্ঞাসা করছেন না কেন? আমি সবার ছোট। আমার নাম খাদিজাতুল আলিয়া।'
মাহবুব মাস্টার চোখের চশমা ঠিক করে বললেন,'ভীষণ বেয়াদব তো! এতো অধৈর্য্য কেন তুমি?'
নুহাশ আলিয়ার মাথায় থাপ্পড় দিয়ে বললো,' মা কী বলছে মনে নেই? বেশি কথা বলতে নিষেধ করেনি?'
আলিয়া কটমট করে নুহাশের দিকে তাকালো। নুহাশ বললো,' খেয়ে ফেলবি আমাকে?'
আলিয়া খামচে ধরলো নুহাশের মাথার চুল। নুহাশও আলিয়ার চুল খামচে ধরে। দুজন ধস্তাধস্তি করে মেঝেতে শুয়ে পড়ে। তারা দুজন কথায় কথায় ঝগড়া বাঁধিয়ে ফেলে।

মাহবুব মাস্টার আঁতকে উঠলেন,হইহই করে চিৎকার করে উঠলেন। পদ্মজা পর্দা ছেড়ে বেরিয়ে আসে। সঙ্গে সঙ্গে নুহাশ ও আলিয়া থেমে গেল৷ সোজা হয়ে দাঁড়ালো। নুড়ি দুই চোখ খিঁচে চাপাস্বরে নুহাশকে বললো,'দিলি তো মা কে রাগিয়ে!'

মাহবুব মাস্টার হতবাক! পদ্মজার মতো নম্রভদ্র শিক্ষিকার এমন উশৃংখল ছেলেমেয়ে! তিনি চশমা ঠিক করতে করতে বললেন,' এত অসভ্য এরা!'
পদ্মজা শীতল চোখে নুহাশ ও আলিয়ার দিকে তাকালো। তারা নতজানু হয়ে আছে। পদ্মজা বললো,' সবাই ভেতরে যাও।'
পদ্মজার কণ্ঠে রাগের আঁচ। তা টের পেয়ে আলিয়ার চোখে জল জমে। প্রায় প্রতিদিন নুহাশ আর তার ঝগড়া হয়। ঝগড়ার জন্য শাস্তি পায় তবুও ভুলে ভুলে আবার ঝগড়া

করে ফেলে। তারা চুপচাপ ঘরের ভেতর চলে গেল। পদ্মজা মৃদু হেসে মাহবুব মাস্টারকে বললো,' ওরা একটু ক্ষেপা ধরণের। ভাইবোন একসাথে থাকলে যা হয়!'

'শয়তানদের মেরুদণ্ড সোজা করতে করতে চুল পেকেছে আমার। এদেরও কয়দিনে সোজা করে ফেলবো।'

'আগামীকাল থেকে আর দুষ্টুমি করবে না। আপনি একটু ভালো করে পড়াবেন। আমার তিনটা ছেলেমেয়েই অংকে কাঁচা।'

'আপনি আমাকে বলেছেন, এতেই যথেষ্ট। অংক ওদের প্রিয় সাবজেক্ট না বানাতে পারলে আমি মাহবুব মাস্টার না।'

পদ্মজা জোরপূর্বক হাসলো। মাহবুব মাস্টার একটু বেশি কথা বলেন। যাওয়ার পূর্বে মাহবুব মাস্টার বলে গেলেন, আগামীকাল থেকে প্রতিদিন সকাল সাতটায় অংক পড়াতে আসবেন।

পড়ন্ত বিকেল! আলিয়া ছবি আঁকছে। সে খুব ভালো ছবি আঁকে। বর্ণনা শুনে হুবহু ছবি আঁকতে পারে! গায়ের রং শ্যামলা। তার নাম আমিরের নামের সাথে মিল রেখে আলিয়া রাখা হয়েছে। পদ্মজা পাঁচ বছর জেলে ছিল। জেল থেকে মুক্তি পাওয়ার পর তার নিঃস্ব জীবনে রূম্পার ছেলে নুহাশের আগমন হয়। রুম্পা নুহাশকে জন্ম দিয়েই মারা যায়। চার-পাঁচ বছর লতিফা আর বাসন্তী নুহাশকে দেখেছে। তারপর পদ্মজা দায়িত্ব নিলো। নুহাশ আর লতিফাকে নিয়ে চলে আসে চা বাগানের দেশ সিলেটে। তার নামে যত সম্পত্তি আমির লিখে দিয়েছিল সেসব পদ্মজা সরকারের দায়িত্বে দিয়েছে।এবং অন্দরমহল ও অলন্দপুরের জমিজমা বিক্রি করে সেই অর্থ দিয়ে এতিমখানা,মসজিদ ও মাদরাসা নির্মাণ করেছে। গরীবদের খাবার,জামা-কাপড় দান করেছে। একটি পয়সাও নিজের জন্য রাখেনি।

খালি হাতে সিলেট এসেছে। সিলেটে পদ্মজার রেনু নামে এক বান্ধবী ছিল । তারা একসাথে ঢাকা পড়েছে। রেনুর সহযোগিতায় পদ্মজা একটা বেসরকারি স্কুলের শিক্ষক হয়। মাস তিনেক পার হতেই পদ্মজা অনুভব করলো,তার বেঁচে থাকা কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। মানসিকভাবে ভেঙে পড়ছে। তাই নুহাশকে নিয়ে ঢাকা ঘুরতে যায়। কথায় কথায় পদ্মজা তুষারকে জানালো,সে একটা মেয়ে বাচ্চা দত্তক নিতে চায়। তুষার এ কথা শুনে বললো,পদ্মজা চাইলে তাদের এলাকার এতিমখানা থেকে বাচ্চা নিতে পারে। তুষারের ভালো পরিচিতি আছে। প্রতি মাসে সে তার বেতনের একাংশ এতিমখানায় দেয়। পদ্মজা কথাটি শুনে খুব খুশি হলো। তুষারের সাহায্যে এতিমখানা থেকে আড়াই বছরের এক শ্যামবর্ণের মেয়েকে দত্তক নিয়ে নিজের মেয়ে মনে করে বুকে জড়িয়ে নেয়। নাম

দেয়,খাদিজাতুল আলিয়া। যেদিন আলিয়াকে নিয়ে বাসায় আসে সেদিন রাতে টের পেল,আলিয়ার শ্বাসকষ্টের সমস্যা আছে। পদ্মজা এরপর দিন সকালে আবার এতিমখানায় গেল। আলিয়ার শ্বাসকষ্ট নিয়ে কথা বলতে। তারা চিকিৎসা করেছে নাকি? ঔষধের নামগুলো কী?

সব জেনে যখন সে এতিমখানা থেকে বের হতে উদ্যত হলো তখন তার পিঠের উপর একটা নুড়ি পাথর এসে পড়ে। পদ্মজা পিছনে ফিরে নুহাশের বয়সী একটা মেয়েকে দেখতে পেল। মেয়েটির থুতনির গর্তটি তার পায়ের তলার মাটি কাঁপিয়ে তুলে। হুবহু আমিরের কাঁটা দাগটির মতো! এক মুহূর্তের জন্য মনে হয়,তার আর আমিরের সন্তান দাঁড়িয়ে আছে। পদ্মজার বুকের ভেতরটা হাহাকার করে উঠে। মেয়েটি দৌড়ে পালায়। পদ্মজা

মেয়েটিকে খুঁজে বের করে। তারপর এতিমখানার দায়িত্বে থাকা কতৃপক্ষকে অনুরোধ করলো, এই মেয়েটিকেও সে দত্তক নিতে চায়। পদ্মজার দূর্বলতা টের পেয়ে লোকটি,বিরাট অংকের টাকা চেয়ে বসে। পদ্মজা বাধ্য হয়ে আশা ছেড়ে দেয়। তবে যে কয়টাদিন ঢাকা ছিল,নিজের অজান্তে বোরকা পরে বার বার এতিমখানার সামনে গিয়ে ঘুরঘুর করেছে। তারপর ফিরে আসে সিলেট। মাস তিনেক অনেক চেষ্টা করেও বাচ্চা মেয়েটির মুখ ভুলতে পারলো না। তার বুকের ভেতর ছোট মেয়েটি যেন আলোড়ন সৃষ্টি করে দিয়েছে। পদ্মজা আবার ঢাকা গেল। নিজ থেকে তুষারকে বললো মেয়েটিকে আনার ব্যবস্থা করে দিতে। তুষার ও প্রেমা দুজনই পদ্মজার অস্থিরতা গভীর ভাবে টের পেল। তুষার দ্রুত সম্ভব মেয়েটিকে নিয়ে আসে। মেয়েটিকে হাতের কাছে পেয়ে পদ্মজা কেঁদে

দেয়। খুশিতে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। নুড়ি পাথরের জন্য মেয়েটিকে পাওয়া বলে,তার নাম দিল আমীরাতুন নিসা নুড়ি।
এই হলো পদ্মজার তিন সন্তানের মা হওয়ার গল্প। সিলেটে তাকে অনেক সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়েছে। সব সমস্যা পেরিয়ে আজ সে এক বেসরকারি স্কুলের সহকারী শিক্ষিক। বিশাল চা বাগানের মধ্যিস্থলে এক কোয়ার্টারে তারা থাকে। তাদের বাড়িটি এক তলা।

পদ্মজা রাতের রান্না করছে। আলিয়া ছবি আঁকার ফাঁকে ফাঁকে পদ্মজাকে দেখছে। নুহাশ ভয়ে তাকাচ্ছেই না। পদ্মজা যখন রেগে যায়। কথা বলা বন্ধ করে দেয়। আর পদ্মজা দূরত্বের রেখা টেনে দিলে তার তিন ছেলেমেয়েদের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। নুড়ি আড়চোখে পদ্মজাকে দেখে আলিয়াকে

ফিসফিসিয়ে বললো,'মা কষ্ট পেয়েছে।'
আলিয়ার চোখ থেকে জল বেরিয়ে আসে। সে কাঁদো কাঁদো স্বরে বললো,' আমি মা কে কষ্ট দিতে চাইনি।'
নুহাশ ব্যথিত স্বরে তাল মিলালো, 'আমিও চাইনি।'
আলিয়া চিৎকার করে উঠলো,'তোমার জন্য হয়েছে ভাইয়া৷ তুমি আমাকে রাগিয়েছো।'
নুড়ি ঠোঁটে এক আঙুল রেখে ইশারা করে চুপ হতো৷ আলিয়া দ্রুত এক হাতে নিজের মুখ চেপে ধরে। সে ভুলে ভুলে আবার চিৎকার করে উঠেছে! নুহাশ ঠোঁট টিপে হাসলো। আলিয়া ভুল করলে তার ভালো লাগে। নুড়ি রান্নাঘরে গিয়ে পদ্মজাকে বললো,' মা,আমি সাহায্য করবো?'
পদ্মজা বললো,' না মা,আমি আর তোমার লুতু খালামনি আছি। বই পড়তে বলেছিলাম পড়া হয়েছে?'

নুড়ি জিহবা কামড়ে বললো,' আল্লাহ! ভুলে গেছি মা।'
'কতদিন বলেছি,ছুটির দিন পাঠ্য বইয়ের বাইরে অন্য বই পড়তে? ভুলে গেলে চলবে? আমাদের ভালো অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত।'
নুড়ি মিইয়ে যাওয়া গলায় বললো,'আর ভুল হবে না।'

পদ্মজা নুড়ির দিকে তাকালো। সবেমাত্র বয়সসন্ধিকালে পা দিয়েছে মেয়েটা। তার ফর্সা সাধারণ মুখশ্রী থুতুনিতে থাকা খাঁচ কাঁটা দাগটির জন্য অসাধারণ হয়ে উঠেছে। মাথায় চুল কোঁকড়া। হাত-পা চিকন চিকন। নুড়ি পদ্মজাকে এভাবে তাকাতে দেখে বিব্রতবোধ করলো। পদ্মজা চোখের দৃষ্টি সরিয়ে বললো,' বাঁদর দুটোকে গিয়ে বল,যদি আমার হাতে মার খেতে না চায় অযু করে জায়নামাযে যেন বসে। এক্ষুনি মাগরিবের আযান পড়বে।'

নুড়ি মাথা নাড়িয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো। পদ্মজা চোখ ছোট করে বললো,' কী হলো?'
'মা,আমি নামায আদায় করতে পারবো না।'
পদ্মজা রেগে কিছু বলতে যাচ্ছিল,তখনই বুঝতে পারলো নুড়ি কেন নামায আদায় করতে পারবে না। সে আমুদে স্বরে বললো,' ও তাহলে আপনি এজন্যই আজ এতো চুপচাপ?'
নুড়ি দাঁত বের করে হাসলো। নুহাশ,আলিয়ার চেয়েও নুড়ি বেশি দুষ্ট। রাগ,জেদ খুব বেশি। তবে পদ্মজার সামনে ভেজা বিড়াল। সে আর যাই করুক,পদ্মজাকে কখনো কষ্ট দিতে চায় না। নিজের অজান্তেও না।
রাতের খাবার পরিবেশন করার সময় লতিফা বললো,' প্রান্ত কোনদিন আইবো কইছে?'
'আগামী মাসে আসবে। ভাবছি,এইবার গ্রামে গিয়ে প্রান্তর বিয়ে দেব। জমিজমা নিয়েই সারাক্ষণ পড়ে থাকে। ধরেবেঁধে বিয়ে দিতে

হবে।’
‘বউ কোন এলাকার আনবা?’
পদ্মজা হাসলো। বললো,’প্রান্ত যা চায়।’
ধপাস করে কিছু একটা পড়ে! নুহাশ আর আলিয়া আবার দুষ্টুমি শুরু করেছে। লতিফা বিরক্তি নিয়ে বললো,’ ওরা দিন দিন খালি শয়তান অইতাছে।’
‘শয়তান বলতে মানা করেছি। আল্লাহর রহমতে আমার ছেলেমেয়েরা আমার গর্ব হবে। আমি টের পাই।’
পদ্মজা এই তিন বাঁদর ছেলেমেয়ের মুখে অলৌকিক কী দেখেছে লতিফার জানা নেই। শুধু এইটুকু জানে,এরা তিনজন যেখানে যায় সে জায়গায় তাণ্ডব শুরু হয়ে যায়। লতিফা জোর গলায় বললো,’ দেহো পদ্মজা,আমি কিন্তু হুদাই কইতাছি না। দিন দিন আরো বিগড়ে যাইবো।’
পদ্মজা লতিফার কথা পাত্তা দিল না। সে খাবার

পরিবেশন শেষে ঘরে চলে যায়। একদিন নুহাশ ও আলিয়াকে রাগ দেখিয়ে চলতে হবে। নুহাশ খাবার খেতে এসে বললো,' লুতু খালামনি,মা খাবে না?'
লতিফা বললো,'না,খাইবো না। তোমরা দুইডায় যেমনে মাস্টারের সামনে পদ্মর মুখ কালা করছো। পদ্ম খাইবো কেন? হে গুসা করছে।'
আলিয়া পদ্মজার ঘরের দরজার দিকে তাকিয়ে বললো,' তাহলে আমরাও খাব না।'
নুড়ি বললো,' তাহলে আরো বেশি রাগ করবে। আরো বেশি কষ্ট পাবে।'
মনে ব্যথা নিয়ে মুখ গুমট করে তারা দুজন খেল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে তিনজন ঘরে গিয়ে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা প্রতিদিন ঘুমাবার পূর্বে তাদের গল্প বলে। গত এক মাস ধরে পদ্মজা একটা গল্প বলছে। গল্পটা এক দুষ্টু রাজা ও এক মিষ্টি রানির। ভালোবাসা সত্ত্বেও

রানি রাজাকে খুন করে। তারপর রানির কারাদণ্ড হয়। কারাদণ্ড হওয়ার পর কখন মুক্তি পেল? পরের জীবনটা কীভাবে কাটলো? বললো না পদ্মজা। সেটা জানার জন্য তিনটি ছেলেমেয়ে উদগ্রীব হয়ে আছে৷ পদ্মজা বলেছিল আজ বলবে, কিন্তু বলার সুযোগই পেল না। নুহাশ ও আলিয়া রাগিয়ে দিল। নুড়ি দরজা লাগিয়ে নুহাশ ও আলিয়াকে ডাকলো। একত্রে বসার পর নুড়ি বললো,'আজ বাবার মৃত্যুবার্ষিকী। তাই কিছু বলার দরকার নেই। কাল সকালে তোরা দুজন মার পায়ে ধরে ফেলবি।'

নুড়ি কথা শেষ করে হাত তালি দিল। যেন সব সমস্যা শেষ! নুহাশ ভ্রু কুঁচকে বললো,'মা,পা ধরে ক্ষমা চাওয়া পছন্দ করে না।'

নুড়ির হাসি মিলিয়ে গেল। আলিয়া বললো,'পেয়েছি,আমরা সব বই পড়ে শেষ করে ফেলবো। মা খুশি হবে।'

‘বছর পার হয়ে যাবে। মা এক বছর রেগে থাকবে?’ বললো নুড়ি।

তারা ঘন্টাখানেক আলোচনা করলো। কোনো পরিকল্পনাই চূড়ান্ত হলো না। একজনের পছন্দ হয় তো অন্যজনের হয় না। হুট করে তারা পদ্মজার গলার স্বর শুনতে পেল। পদ্মজা লতিফাকে বলছে,’ লুতু বুবু,বাড়ির বড় বিড়ালদের বলে দাও তাদের ফিসফিসানি শোনা যাচ্ছে।’

নুহাশ,নুড়ি ও আলিয়া দ্রুত লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়ে। পদ্মজা মাঝ রাতে নিজ ঘর থেকে বের হয়। লতিফা জেগে ছিল। তাহাজ্জুদ নামাজ আদায় করছে। পদ্মজার সংস্পর্শে এসে তার মুখের আঞ্চলিক ভাষা ছাড়া সব পাল্টে গেছে। রিনুকে বিয়ে দিয়েই সে পদ্মজার সঙ্গী হয়েছে। লতিফা জায়নামাজ ছেড়ে উঠতেই পদ্মজা বললো,’ আমি বের হচ্ছি। আমাকে না পেয়ে ওরা যেন বের না হয়।

আশেপাশের অবস্থা ভালো না। পাশের এলাকায় পর পর দুটো লাশ পাওয়া গেছে। এখানে আবার কোন চক্রান্ত চলছে কে জানে! দরজা বন্ধ করে রেখ।'

'তুমিও যাইয়ো না পদ্ম।'

পদ্মজা শুনলো না। প্রথমে ছেলেমেয়েদের ঘরে গেল। নুড়ি ও আলিয়া এক বিছানায় ঘুমাচ্ছে। আর নুহাশ পাশের বিছানায়। পদ্মজা ঘুমন্ত তিন ছেলেমেয়ের কপালে চুমু দিয়ে আলতো করে মুখ ছুঁয়ে দিল। এই তিনটে ফুটফুটে ছেলেমেয়েকে সে ভীষণ ভালোবাসে। তাদের জন্য পদ্মজা নিজের জীবন কোরবান দিতেও প্রস্তুত। জীবনে যতটুকু আনন্দ আছে তার পুরোটা অবদান নুড়ি,নুহাশ আর আলিয়ার। পদ্মজা অনেকক্ষণ বসে রইলো। তারপর ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো বাইরে। কোয়ার্টার ছেড়ে বের হতেই নিঃসঙ্গতা কামড়ে

ধরে তাকে। আমিরের প্রতিটি মৃত্যুবার্ষিকীর রাত সে খোলা আকাশের নিচে কাটায়। চোখ বন্ধ করে অনুভব করে ফেলে আসা স্মৃতিগুলো। এই সময়টুকু একান্ত তার আর আমিরের৷
ঘন্টাখানেক হেঁটে এসে এক পাহাড়ের চূড়ায় দাঁড়ালো পদ্মজা। এই পাহাড়টি এখানকার সবচেয়ে উঁচু পাহাড়। একটা মই হলেই যেন আকাশ ছোঁয়া যাবে। আকাশের গায়ে লক্ষ লক্ষ তারা জ্বলজ্বল করছে। এর মাঝে কোন তারাগুলো পদ্মজার প্রিয়জন? পদ্মজা এক হাত আকাশের দিকে বাড়িয়ে ভেজা কণ্ঠে উচ্চারণ করলো,'আমার প্রিয়জনেরা!'

তার এই দুটি শব্দে প্রকাশ পায় ভেতরের সব দুঃখ,যন্ত্রণা, অভাববোধ। মা-বাবা,বোন,স্বামী,শ্বাশুড়ি সবাই আকাশটাতে থাকে। শুধু সে জমিনে রয়ে গেছে। পদ্মজা

চোখ বুজলো। সাঁইসাঁই করে বাতাস বইছে। বাতাসের শব্দ শোনা যাচ্ছে। ঠান্ডায় শরীরে কাঁটা দিচ্ছে। চোখের পাতায় দৃশ্যমান হয়,হেমলতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,রুক্ষমূর্তি, পূর্ণার আহ্লাদ, হাসি,আমিরের ছোঁয়ার বাহানা,বুকে নিয়ে কান্না থামানো। কত সুন্দর অতীত! কতোটা সুন্দর! পদ্মজা চোখ খুললো। তার ঘোলা দুটি চোখ জলে ভরে উঠেছে। সে শিশির ভেজা ঘাসের উপর বসলো। দিনটা কেটে যায়, রাতটা তার কাটে না। আমির শয়নেস্বপনে রাজত্ব করে। পদ্মজা অসহায় চোখ দুটি মেলে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে। হঠাৎ করে যদি তার স্বামীর মুখটা ভেসে উঠতো! কেমন আছে সে? পদ্মজার দুই চোখ বেয়ে জলের ধারা নামে। নীরবে কাঁদতে থাকে। কী ভীষণ অসহায় দেখাচ্ছে তাকে! দিনের আলোয় দেখা কঠিন ব্যক্তিত্বসম্পন্ন, রাগী পদ্মজা রাতের বেলায় এমন অসহায় হয়ে

কাঁদে কেউ বিশ্বাস করবে? করবে না। পদ্মজা হাঁটুতে মুখ গুঁজে স্মৃতি হাতড়ে বেড়াচ্ছে। হঠাৎ সে কারো উপস্থিতি টের পেল। তার দিকে কেউ হেঁটে আসছে। গত দুই সপ্তাহে দুটো খুন হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে পাশের এলাকায়। এলাকাটি খুব কাছে। লাশের ছবি দেখে বুঝা গেছে,কেউ বা কারা দেশে আতঙ্ক ছড়ানোর চেষ্টা করছে৷ সেই সাথে লাশের শরীরের ক্ষতস্থান দেখে মনে হয়েছে,হত্যাকারী বা হত্যাকারীরা শয়তানের উপাসনা করে। পদ্মজার মস্তিষ্ক সক্রিয় হয়। সে তার কোমরের খাঁজে থাকা খাপ থেকে ছুরি বের করলো। তারপর দ্রুত ঘুরে দাঁড়ালো। দেখলো নুড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তার পরনে কালো বোরকা। নুড়িকে দেখে পদ্মজা অবাক হয়। সেকেন্ড কয়েকের মধ্যে অবাকের ছাপটা মুখ থেকে সরেও গেল। নুড়ি প্রায় সময় তাকে অনুসরণ করে। সে পদ্মজাকে একা ছাড়তে

নারাজ। পদ্মজা ঘাসের উপর বসতে বসতে বললো,' পিছু নিতে না করেছিলাম।'
নুড়ি কিছু বললো না। পদ্মজাও চুপ রইলো। নুড়ি ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনে তাকালো। নুহাশ ও আলিয়া দূরে দাঁড়িয়ে আছে। তাদের চেয়েও দূরে দাঁড়িয়ে আছে লতিফা। লতিফা নুড়িদের আটকানোর চেষ্টা করেছো কিন্তু বাঁদরদের সে আটকে রাখতে পারলো না। পারে তো তারা লতিফার হা-পা বেঁধে ফেলে। নুড়ি সাবধানে ডাকলো,'মা?'
পদ্মজা দূরে চোখ রেখে নির্বিকার কণ্ঠে বললো,' বল।'
'বাবার জন্য কাঁদছিলে?'
পদ্মজা নিরুত্তর। নুড়ি সময় নিয়ে দ্বিধাভরে জিজ্ঞাসা করলো,' দুষ্টু রাজাটা বাবা আর মিষ্টি রানীটা তুমি তাই না আম্মা?'
পদ্মজা চমকে তাকালো। অপলকভাবে তাকিয়েই রইলো। নুড়ি কী করে

জানলো,তাদেরকে বলা গল্পটি তাদেরই মায়ের গল্প! নুড়িকে দেখলে মনে হয় না,সে যে পদ্মজা ও আমির হাওলাদারের নিজের মেয়ে নয়। নুড়ির চোখের দৃষ্টি ঈগলের মতো। যেমন চঞ্চল তেমন সাহস। সে ক্ষোভ নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না। আশেপাশে যা কিছুই ঘটুক সর্বপ্রথম তার চোখে ধরা পড়ে। পদ্মজা নুড়ির প্রশ্ন এড়িয়ে চুপচাপ বসে রইলো। নুড়ি সংকোচ নিয়ে বললো,' মা,তুমি সোয়েটার পরোনি। ঠান্ডা লাগবে।'

পদ্মজা খাপে ছুরি রেখে বললো,' নুহাশ আর আলিয়াও এসেছে?'

নুড়ি মাথা ঝাঁকালো। পদ্মজা নুড়িকে নিয়ে নিচে নেমে আসে। নুহাশ ও আলিয়ার সামনে এসে তিনজনের উদ্দেশ্যে বললো,'সাহসী সঠিক সময়ে হতে বলেছি। এই রাতের বেলা ঝুঁকি নিয়ে মায়ের পিছু নিতে নয়।'

লতিফা এগিয়ে এসে বললো,' তোমারে লইয়া

হেরা চিন্তাত আছিলো। খুনটুন যে হইলো গত সপ্তাত এর লাইগগা।"
পদ্মজা ভ্রু উঁচিয়ে বললো,' তাহলে ওরা আমাকে বিপদের হাত থেকে বাঁচাতে এসেছে?'
নুড়ি,নুহাশ ও আলিয়া ভয়ে একজন আরেকজন চাওয়াচাওয়ি করলো। পদ্মজা হেসে তিনজনকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরে বললো,' আমার সাহসী বাচ্চারা! কিন্তু এতো রাতে আসা একদম ঠিক হয়নি। হ্যাঁ আমারও ঠিক হয়নি। আমরা কেউই আর ভুল করবো না। ঠিক আছে?'
তিনজন সমস্বরে বললো,'ঠিক আছে মা।'

পদ্মজা তার ছেলেমেয়েদের নিয়ে পাহাড় ছেড়ে সমতলে নামে। পথে আলিয়া বললো,'মা,একটা কথা বলবো।'
পদ্মজা আদুরে স্বরে বললো,'বলো বাবা।'

‘মজনু স্যার রূপকথা দিদিকে কিছু বলেছে মনে হয়।’

পদ্মজার কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়ে। মজনু তার স্কুলেরই একজন শিক্ষক। নবম ও দশম শ্রেণির ছাত্রীদের বাংলা পড়ায়। তার নামে অনেক অভিযোগ আছে। ছাত্রীদের হ্যারাস করে। শরীরে বিভিন্ন অজুহাতে হাত দেয়। বিয়ে করেছে দুটি। অনেক মেয়ে মজনুর জন্য স্কুলে আসা ছেড়ে দিয়েছে। তারা কিছু বলতেও পারে না,সইতেও পারে না। মাস ছয়েক আগে স্কুলের এক মেয়ে দাবি করেছে,সে গর্ভবতী। মজনু তাকে ভয় দেখিয়ে অনেকবার শারিরীক সম্পর্ক করেছে। মজনু অস্বীকার করে। উল্টো সমাজে মেয়েটির বদনাম হয়। তাকে আর স্কুলে দেখা যায়নি। পদ্মজা সত্যতা নিশ্চিত করার জন্য মেয়েটিকে খুঁজেছে। কিন্তু পেল না। তার পরিবারকেও পেল না। মজনু

পদ্মজার সাথে ঘেঁষার চেষ্টাও করেছে অনেকবার। চরিত্রহীন,লম্পট পুরুষ সে। পদ্মজা কর্তৃপক্ষের কাছে অভিযোগ পাঠিয়েছিল,লাভ হয়নি। মজনু সিলেটের এমপি সুহিন আলমের শালা। এজন্যই পদ্মজার অভিযোগ গ্রহণযোগ্য হয়নি। এমনকি সেই মেয়েটির পরিবার নাকি মামলা করেছিল,সেই মামলাও ধামাচাপা পড়ে যায় সুহিন আলমের ক্ষমতার কাছে। তাই মজনুর নাম উঠতেই পদ্মজা বিচলিত হয়ে উঠে। বললো,'কেন এমন মনে হলো?'

নুড়ি মাথা নিচু করে বললো,'রূপকথা দিদিকে ডেকেছিল মনে হয়। অনেকক্ষণ পর দিদি দ্বিতীয় ভবন থেকে বের হয়। তখন দিদি কাঁদছিল। দিদির চুল ঢোকার সময় খোঁপা ছিল বের হওয়ার সময় এলোমেলো ছিল।'

আলিয়া বললো,'আমি আর নুড়ি আপা রূপকথা দিদিকে টিফিন টাইমে জাম গাছের

পিছনে দাঁড়িয়ে কাঁদতে দেখেছি মা।'
পদ্মজা তাদের মেয়েদের আশ্বস্ত করলো। বললো,সব ঠিক হয়ে যাবে। সারা রাত পদ্মজা এ নিয়ে ভেবেছে। মজনুকে আর সহ্য করা যায় না। মেয়েগুলোর জীবনের সুন্দর মুহূর্তগুলোকে দূষিত করে ফেলছে! আবর্জনা বেশিদিন রাখা ঠিক হচ্ছে না। চারপাশে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছে! পরদিনই স্কুলে গিয়ে পদ্মজা রূপকথাকে ডেকে পাঠালো। রূপকথা হিন্দু ধর্মালম্বী। খুব সুন্দর মেয়ে। রূপকথার ধর্মের ভাষায় বলা যায়, সে দেবীর মতো সুন্দর! নবম শ্রেণিতে পড়ে। রূপকথা পদ্মজার সামনে এসে কাচুমাচু হয়ে দাঁড়ালো। পদ্মজা রূপকথাকে পরখ করে বললো,'তোমাকে ভীষণ হতাশাগ্রস্ত আর ভীতগ্রস্ত দেখাচ্ছে। আমাকে তোমার সমস্যা খুলে বলতে পারো।'
রূপকথা পদ্মজার কথায় অপ্রতিভ হয়ে উঠলো। পদ্মজা চেয়ার ছেড়ে রূপকথার পাশে

এসে দাঁড়ায়। রূপকথার মাথায় হাত রেখে বললো,' মনের মাঝে চেপে রেখো না। কষ্ট লুকিয়ে রাখতে নেই। হাতের মুঠোয় এনে চেপে ধরে ধ্বংস করে দিতে হয়।'
রূপকথা পদ্মজার সংস্পর্শে আজ প্রথম এসেছে। পদ্মজাকে প্রতিটি ছাত্রছাত্রী সম্মান করে,ভালোবাসে। তার ব্যবহার এবং সৌন্দর্য দুটোই সবাইকে অভিভূত করে ফেলে। অনেকে বলে পদ্মজার শরীরে তারা নাকি মা মা গন্ধ খুঁজে পায়। রূপকথাও পাচ্ছে। সে কেঁদে ফেললো। পদ্মজা রূপকথার মুখটা উঁচু করে ধরলো। বড়,বড় আঁখি তার। লাল টুকটুকে গাল,জোড়া ভ্রু। এমন সুন্দর মেয়ে কাঁদতে পারে! পদ্মজা বললো,' মজনু স্যার কী বলেছে তোমাকে? আমাকে বলো। '

রূপকথা অনেক কষ্টে কান্না আটকে বললো,' আমার মা-বাবা নেই। জ্যাঠা জ্যাঠামির কাছে

থাকি। ঠাম্মার কথায় জ্যাঠা আমাকে পড়াচ্ছে। দিঘীপাড়ার সতেন্দ্র বাবু আমাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন। জ্যাঠা বলেছে, পরীক্ষায় যদি ফেইল করি আমাকে বিয়ে দিয়ে দিবে।'
পদ্মজা জানতে চাইলো,'সতেন্দ্র বাবু মানে দিঘীপাড়ার মোড়ের মধু ব্যবসায়ী ?'
'হু।'
'উনি তো তোমার দাদার বয়সী। আর যেহেতু তোমার জ্যাঠা বলেছে, ফেইল করলে বিয়ে দিয়ে দিবে। তাহলে পাস করার চেষ্টা করো।'
রূপকথার কান্না বাড়লো। পদ্মজা বুঝতে পারলো,এখানে আরো ঘটনা আছে। সে কোমল কণ্ঠে বললো,'লক্ষী মেয়ে,সবটা বলো আমাকে।'
রূপকথা বললো,' মজনু স্যার বলেছেন,উনার সাথে প্রেম না করলে আমাকে ফেইল করিয়ে দিবেন। উনার সাথে যেন প্রেম করি। আমি ভয় পেয়ে যাই। আমি জানি না প্রেম কীভাবে

করে। উনি যখন আমাকে ডাকেন,আমি যাই। আমাকে অনেক কষ্ট দেয়। শরীরে হাত দেয়। আমার ভালো লাগে না। রাতে ঘুমাতে পারি না। ঠাম্মাকে বলছি,ঠাম্মা বলছে স্যার যা বলে শুনতে। তাহলে বেশি মার্ক পাবো। স্যার গত পরশু আমাকে বলছে,আমি আজ যেন স্যারের সাথে ঘুরতে যাই।'

রূপকথা কাঁপছে। হেঁচকি তুলে কাঁদছে। অনাথ মেয়েটা! মা-বাবার আদর ছাড়া বড় হয়েছে। আপন দাদি সমস্যা শুনে বলেছে,স্যার যা বলে শুনতে। এতে নাকি বেশি মার্ক পাবে! কেমন মানসিকতা! আজ ঘুরতে গিয়ে জানোয়ারটা মেয়েটার কতবড় ক্ষতি করে ফেলবে কে জানে! মজনু সেই অভাগী মেয়েটিকেও কি এভাবে ভয় দেখিয়ে কাছে টেনেছিল? পদ্মজা রূপকথাকে বুকের সাথে চেপে ধরে। পদ্মজার গায়ের মিষ্টি ঘ্রাণে রূপকথা ডুবে যায়। মনে হচ্ছে,সে তার মাকে

জড়িয়ে ধরেছে। তার কান্নার বেগ বাড়ে। পদ্মজা রূপকথার মাথায় হাত বুলিয়ে বললো,' এই ব্যাপারে আর কাউকে কিছু বলো না। আজ বাড়ি চলে যাও।'

স্কুল ছুটির পর পদ্মজা মজনুর পিছু নেয়। মজনু তার বাসায় না গিয়ে সিলেট বোরহান উদ্দিন মাজারের পাশের এলাকায় গেল। পদ্মজাও সেখানে গেল। মজনু বার বার হাতের ঘড়ি দেখছে। বুঝা যাচ্ছে, সে কারোর জন্য অপেক্ষা করছে। পদ্মজা একটা সাদা বিল্ডিংয়ের পিছনে দাঁড়িয়ে থাকে। প্রায় চল্লিশ মিনিট পর তাদের স্কুলের জামা পরা একটা মেয়ে মজনুর সাথে দেখা করতে আসে। পদ্মজা ঘৃণায় কপাল কুঞ্চিত করলো। মজনু পড়ানোর জন্য নয় সুযোগ ব্যবহার করে মেয়েদের ভোগ করার জন্য শিক্ষক হয়েছে। শিক্ষক কখনো লম্পট হয় না,লম্পটরা

শিক্ষকের মুখোশ পরে। পদ্মজা পর পর তিনদিন সাবধানে মজনুকে অনুসরণ করে নিশ্চিত হয়েছে, মজনু রাতে ঘুমাবার পূর্বে বাইরে টং দোকানে চা খেতে যায়। তারপর সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে বাড়ি ফিরে। রাস্তার দুই পাশে ঝোপজঙ্গল।এটা মজনুর প্রিয় অভ্যাস হতে পারে। রূপকথা তিনদিন পদ্মজার কথায় স্কুলে আসেনি। চতুর্থ দিন শেষে রাত আটটায় পদ্মজা একখানা বড় লাগেজে একটি বড় ধানের বস্তা ও রাম দা নিল। খুলে নিল নিজের কানের দুল। শরীরে এমন কিছু রাখলো না, যা প্রমাণ হিসেবে কাজে লাগতে পারে। কাঁধের ব্যাগে নিল বোরকা ও রুমাল । তারপর নতুন শাল দিয়ে মাথা ঢেকে বেরিয়ে পড়লো।

রাত ঠিক দশটা বাজে তখন। চারিদিকে সুনসান নীরবতা। ঠান্ডা বাতাস বইছে।

মাঝেমধ্যে শেয়ালের ডাকও শোনা যাচ্ছে। মজনু সিগারেট ফুঁকতে ফুঁকতে গুনগুন করে গান গেয়ে বাড়ির দিকে যাচ্ছে৷ হাঁটছে হেলেদুলে। আশেপাশে গাছপালা বেশি। রাস্তার দুই ধারের ঝোপজঙ্গল গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা। দূরে ল্যাম্পপোস্টের আলো নিভু নিভু হয়ে জ্বলছে। এদিকটায় মানুষজন তেমন আসে না।

পদ্মজা রাম দা নিয়ে একটা বড় গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে আছে। তার লাগেজ ও কাঁধ ব্যাগটি কিছুটা দূরে রাখা। সে তীক্ষ্ণ চোখ দুটি মেলে অপেক্ষা করছে মজনুর জন্য। চোখ দুটি যেন জ্বলজ্বল করছে। তার নিঃশ্বাসেও যেন ছন্দ রয়েছে। শরীর ঠান্ডা করা ছন্দ! আর সেই ছন্দে আছে প্রলয়ঙ্কারী ঝড়ের পূর্বাভাস!

মজনুর দেখা মিলতেই পদ্মজা চাপাস্বরে ডাকলো,' স্যার...স্যার।'

যেন অশরীরী ডাকছে। মজনুর একটু ভয় করলেও উৎসুক হয়ে ডানে তাকালো। জঙ্গল থেকে কে ডাকছে! মজনু উঁচু স্বরে প্রশ্ন করলো,'কে?'

'আমি স্যার...'

কণ্ঠস্বরটা চেনা মনে হচ্ছে। তবে কেমন যেন ভূতুড়ে এবং ভারী! মজনু হাতের সিগারেট ফেলে দুই পা এগিয়ে গেল। বললো,'আমিটা কে?'

"আমি পদ্মজা।"

সমাপ্ত।

®ইলমা বেহরোজ